¯úU : †bÎ‡Kvbv

bó †mŠ›`h Avi HwZn¨ nq †hfv‡e

Ae‡njv Avi Ah‡Z G‡`‡ki cKwZi ˆbmwMK †mŠ›`h AvR nwi‡q hv‡”Q| †bÎ‡Kvbvi `Mvci Avi Kgjv‡Kv›`v _vbv GjvKvwUB Zvi DrKó D`vniY| wKš cwiKíbv wb‡q GwM‡q †M‡j Gme ¯vb¸‡jv chUb †K›` wn‡m‡e M‡o DV‡Z cv‡i...

wj‡L‡Qb আসাদুর রহমান

হাওর-বাঁওড়ের দেশ নেত্রকোনা। জেলাটি সম্পর্কে আমাদের মাঝে এ ধারণাটিই প্রচলিত। কিন্তু নেত্রকোনা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ তা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। পাহাড়, টিলা আর নদীগুলো জেলার দুর্গাপুর আর কলমাকান্দা থানা এলাকাটিকে নৈসর্গিক সৌন্দর্যে গড়ে তুলেছে।

নেত্রকোনা থেকে ২৫ কিলোমিটার পথ পেরুলে পৌঁছে যাওয়া যায় কলমাকান্দায়। ২৫ কিলোমিটার পথ পার হতে সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট সময় লাগার কথা, কিন্তু এ পথ পাড়ি দিতে

সময় লাগে প্রায় ২ ঘন্টা। এমনিতেই নেত্রকোনা থেকে কলমাকান্দার পথটি ভাঙাচোরা। তার ওপর পার হতে হয় দুটি নদী।

প্রথম নদীটি কংশ নদীর শাখা গোলামখালী নদী। তার পরের নদীটি হলো উদ্দাখালী নদী। নদী দুটি শীতকালে একেবারে শুকিয়ে যায় বলে এখানে ফেরি ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি। তাই নেত্রকোনা থেকে কলমাকান্দা যেতে দু'বার বাস বদল করতে হয়। সরকারের উদাসীনতার

স্টিলের কাঠামো দিয়ে ব্রিজের কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান স্টিলের কাঠামো তৈরির কাজ বন্ধ করে দেয়ায় অর্ধসমাপ্ত এই ব্রিজ দুটি পড়ে আছে

কারণে মানুষ এই দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। নদী দুটির ওপর ব্রিজ করার জন্য পিলার স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে; বাকি কাজটুকু প্রায় ১০ বছর ধরে পড়ে আছে। স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা যায়, প্রথমে স্টিলের কাঠামো দিয়ে ব্রিজের কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান স্টিলের কাঠামো তৈরির কাজ বন্ধ করে দেয়ায় অর্ধসমাপ্ত এই ব্রিজ দুটি পড়ে আছে। বর্তমানে ঢালাইয়ের সাহায্যে বাকি কাজ করার পরিকল্পনা চলছে। কিন্তু সেজন্য যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন তার বরাদ্দ নেই, ফলে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে এই অর্ধসমাপ্ত সেতু দুটি। মানুষ পোহাচ্ছে নিরন্তর দুর্ভোগ।

কলমাকান্দা থানা সদর থেকে আধঘন্টায় পৌঁছানো যায় নয়নমুগ্ধকর পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে। এখানকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান হলো লেঙ্গুরা ইউনিয়ন।

একেবারে সীমান্তবর্তী এই ইউনিয়নটি গারো পাহাড়ের কোলে অবস্থিত। পাহাড় আর টিলায় সমৃদ্ধ লেঙ্গুরা। লেঙ্গুরার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে অসংখ্য পাহাড়ি ঝরনাধারা। স্থানীয়দের কাছে এই পানির ধারাগুলো ছড়া নামে পরিচিত।

সীমান্তের ওপারে রয়েছে ভারতের মেঘালয় রাজ্য। মেঘালয়ের উঁচু পাহাড় আর ঘন বন বাংলাদেশের ভূভাগে বসে ভারত উপভোগ করার সুযোগ করে দেয়।

এ এলাকাটি এক সময়ে ছিল গভীর বন এলাকা। ছিল বন্যপ্রাণীতে পূর্ণ। হরিণ, ভালুক, হাতি ছিল এখানে। আজ থেকে ৫ বছর আগে এই এলাকায় একটি বাঘও মারা হয়েছে। কিন্তু এখন আর বাংলাদেশ অংশে কোনো বন্যপ্রাণী নেই। বলতে গেলে এখানে আর এখন কোনো বন অবশিষ্ট নেই। স্থানীয় বাঙালি আর গারো আদিবাসীরা মিলে গারো পাহাড়ের এই অংশের বনভূমিকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছে। তবে এখনও মেঘালয় থেকে রাতে হাতি আমাদের অংশে চলে আসে। ক্ষেতের ধান খেয়ে চলে যায়। মাঝে মাঝে দু-একটি বাড়িঘরও নষ্ট করে দেয়।

মূলত লেঙ্গুরা ইউনিয়ন থেকে ভারতের মেঘালয়কে একটি ছড়ার মাধ্যমে ভাগ করা হয়েছে। বর্ষাকালে এই ছড়ায় পাহাড়ি ঢল খুব দ্রুতবেগে ছুটে চলে। বলেশ্বরী নদী এই ছড়ার শেষ ঠিকানা। এই ছড়াটির পাশে যেকোনো স্থানে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। তবে ছড়ার ওপারে কিছু এলাকা বাংলাদেশ অংশে পড়েছে। যেমন চেঙ্গীবাজার। চেঙ্গীবাজার মূলত একটি বন এলাকা। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু বন এখানে এখনো টিকে আছে। তবে কিছুদিন পর পর টেন্ডারের মাধ্যমে এখানকার গাছগুলো কেটে নিঃশেষ করে ফেলা হচ্ছে। এতে স্থানীয় বন্যপ্রাণীগুলোর জীবনে নেমে আসছে বিরূপ প্রভাব।

চৈত্র মাসে চেঙ্গীবাজার এলাকায় বসে বিখ্যাত চেঙ্গী মেলা। তখন প্রায় ১ সপ্তাহের জন্য ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত খুলে দেয়া হয়। মেলায় দেশী-বিদেশী বিপুল পণ্যের সমাবেশ ঘটে। বিশাল এই মেলা স্থানীয়দের কাছে খুবই আকর্ষণীয়।

লেঙ্গুরা ইউনিয়নের বালুচরা, হাতিবেড়, কাউবাড়ী, নলচাপড়া প্রভৃতি পাহাড়ঘেরা গ্রামগুলো খুবই আকর্ষণীয়। গারো আদিবাসীদের জীবনযাত্রার খুবই কাছাকাছি চলে যাওয়া যায় এ গ্রামগুলোতে এসে। অতিথিপরায়ণ এই আদিবাসী পরিবারগুলোর আতিথেয়তা যে কাউকে মুগ্ধ করে।

কিছুটা সমতল ভূমি,ধানক্ষেত, তারপর হঠাৎ একটি টিলা তার ডান দিকে আবার ধানক্ষেত আবার বেশ উঁচু পাহাড়, তার বাঁদিকে সারিবদ্ধ উঁচু টিলা- লেঙ্গুরা ইউনিয়নের ভূ-ভাগটি মূলত এভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাহাড় আর টিলায় পূর্ণ।

দৃষ্টিনন্দন এই এলাকাটি অযত্ন আর অবহেলায় প্রতিদিনই তার সৌন্দর্য হারাচ্ছে। স্থানটিতে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠলে বাংলাদেশের গ্রাম আর গারো জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে পর্যটকের। পাহাড়, ধানক্ষেত, আনারসের বাগান স্থানটিকে পর্যটকদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তুলবে।

কলমাকান্দা থেকে লেঙ্গুরা ইউনিয়ন যাবার পথে নাজিরপুর ইউনিয়ন। নাজিরপুর ইউনিয়ন থেকে ২০ টাকা রিকশা ভাড়া দিয়ে যাওয়া যায় দুর্গাপুর। ঝকঝকে পাকা রাস্তায় আধঘন্টায় পার হওয়া যায় এই ১০ কিলোমিটার রাস্তা। এই রাস্তাটি রিকশায় ভ্রমণ করা সবচেয়ে উপযুক্ত। কারণ এ স্থানটি হাওর এলাকা হওয়ায় রাস্তার দু'পাশের ধানক্ষেত বর্ষাকালে যেন বিশাল নদীতে পরিণত হয়। শীতকালে সেটি আবার বিশাল ধানক্ষেত। নদী বা ধানক্ষেতের শেষ প্রান্তে সারিবদ্ধ পাহাড়। মেঘ ছুঁয়ে যায় এই পাহাড়গুলো। দৃষ্টিনন্দন এই পাহাড়গুলো সম্পর্কে জানতে চাইলে স্থানীয়রা যখন বলে এগুলো মেঘালয় রাজ্যের পাহাড়, তখন পাহাড়গুলো ছুঁয়ে দেখার সুযোগ নেই ভেবে মন দুঃখে ভরে ওঠে।

রিকশা যাত্রা শেষে দুর্গাপুর। বলা হয়ে থাকে পাহাড়ঘেরা দুর্গাপুর। দুর্গাপুর থানা সদরে রয়েছে দুর্গাপুর রাজার রাজবাড়ী। প্রতাপশালী এই রাজার চিহ্নগুলো যত্নের অভাবে প্রতিদিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যতটুকু আছে তার অবস্থাও এখন করুণ। রাজবাড়ী এলাকায় কলেজ গড়ে তোলা হয়েছে।

দুর্গাপুরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সোমেশ্বরী নদী। সোমেশ্বরী নদীর আরতাখালী ব্লকে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে দুর্গাপুরের সমস্ত সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। নদী, পাহাড়, বন সব মিলিয়ে যেন এক অপূর্বরূপে সেজে আছে দুর্গাপুর। এখানে দাঁড়িয়ে কামারখালী, রানী কংয়ের মতো নয়নজুড়ানো স্থানগুলো উপভোগ করা যায়।

পাহাড়ি ঢলে সৃষ্টি হয়েছে সোমেশ্বরী নদীটি। তাই বর্ষাকালে এই নদীর যেমন ভয়াল

রূপ থাকে, তেমনি শীতকালে একেবারে শুকিয়ে যায়। তখন সোমেশ্বরীর বুক দিয়ে পায়ে হেঁটে পাড়ি দেয়া যায়। বর্ষাকালে পাহাড়ি ঢলের সঙ্গে ভারতীয় পাহাড়গুলো থেকে নেমে আসে পাথর ও কয়লা। স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী জাল দিয়ে এই কয়লা সংগ্রহ করে। কয়লা সংগ্রহের এই দৃশ্য খুবই চমৎকার।

সোমেশ্বরী পার হয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় কামারখালী ইউনিয়ন। সেখান থেকে রিকশায় ভাঙাচোরা ১ ঘন্টার পথ পেরিয়ে বিজয়পুর গ্রাম। অসাধারণ এই বিজয়পুর গ্রামটি অসংখ্য পাহাড় আর টিলায় ভরা।

কিছু সিরামিক প্রতিষ্ঠান চীনামাটি সংগ্রহে কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে যথেচ্ছভাবে কাটছে পাহাড়গুলো

মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই গ্রামটি বাংলাদেশ সরকারের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাত নম্বর স্থানে রয়েছে। এখানে রয়েছে ৯ট লাল পাহাড়। অপূর্ব সুন্দর এই পাহাড়গুলোর রঙ গাঢ় গোলাপি। দূর থেকে মনে হয় টকটকে কয়েকটি লাল পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। সুউচ্চ আর আগাছায় ভরা এই পাহাড়গুলোর প্রতিটিই সাদামাটির খনি। ঢাকার কিছু নামকরা সিরামিক প্রতিষ্ঠান তাদের কাজে ব্যবহারের জন্য এই পাহাড়গুলো লিজ নিয়েছে। চীনামাটি সংগ্রহের কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে তারা যথেচ্ছভাবে কেটে চলেছে পাহাড়গুলো। সিরামিক প্রতিষ্ঠানগুলো একদিকে যেমন শ্রমিকদের পর্যাপ্ত মজুরি দিচ্ছে না, অন্যদিকে তারা প্রতিবছর ফাঁকি দিচ্ছে মোটা অঙ্কের সরকারি রাজস্ব। এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে রয়েছে চরম ক্ষোভ। এ বিষয়ে ১ নং কোল্লাপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান পাঠান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, এই পাহাড় থেকে যে ট্যাক্স পাওয়ার কথা, তার ২৫ ভাগও যদি পাওয়া যেতো তবে এখানে কোনো কাঁচা রাস্তা থাকতো না।

কামারখালী, বিজয়পুর, কোল্লাপাড়া, পাচকানিয়া, আড়াপাড়া প্রভৃতি এলাকা পাহাড় আর টিলায় সমৃদ্ধ। এই এলাকাটি একসময় বিশাল বনভূমি ছিল। কিন্তু এখন তা কেটে একেবারেই পরিষ্কার। বন বিভাগ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে এখানের কিছু টিলায় বনায়ন কার্যক্রম শুরু করেছে। কিন্ত তা বেশিদিন স্থায়ী হচ্ছে না। ৫/৭ বছর পর সেসব গাছ কেটে ফেলায় এলাকাটিতে স্থায়ী বনভূমি সৃষ্টি হতে পারছে না। স্থায়ী বনভূমির অভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে এ এলাকার বন্য প্রাণীগুলোর উপর। বন্য প্রাণীগুলো আশ্রয় নিয়েছে ভারতীয় এলাকায়। যেগুলো ছিল তা স্থানীয়রা মেরে কেটে শেষ করেছে। মেঘালয় থেকে মাঝে মাঝে হাতি, হরিণ নেমে আসে। হাতিগুলোকে স্থানীয়রা ভয়ে কিছু বলে না, কিন্তু হরিণ পেলে আর রক্ষা নেই। যে করেই হোক হরিণ ধরে জবাই করতে হবে। হরিণ হত্যা এখন এই এলাকাগুলোতে সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে। নিয়ম রয়েছে হরিণ ধরতে যেসব বাড়ির লোকজন ছুটে আসবে তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে সেই হরিণের মাংস পাঠাতে হবে। প্রতিদিন এই এলাকাগুলো থেকে ভারতীয় হরিণ পাচার হয়। মোটরসাইকেলে করে হরিণ পাচারের দৃশ্য সন্ধ্যার পর এই এলাকাগুলোর নিত্যদিনের চিত্র।

মূলত দুর্গাপুরের এই এলাকাগুলোতে এখন চলছে প্রকাশ্য লুটপাট। কোনো নিয়মনীতি, আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে যে যে যেভাবে পারছে এখানে লুটপাট চালাচ্ছে। দিনে-দুপুরে মহিষের গাড়িভর্তি অবৈধ কাঠ পাচার হচ্ছে। বন বিভাগে কর্মকর্তারা রয়েছে এদের সঙ্গে। ফলে চোরাকারবারীদের কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। অন্যদিকে কাঠ চুরির অপরাধে স্থানীয়দের মামলার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

কিন্তু এই এলাকাটি হতে পারতো দেশের একটি অন্যতম ট্যুরিস্ট স্পট, শুধু দৃষ্টিনন্দন সোমেশ্বরী নদীর সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়েই এখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব। পাশাপাশি চীনামাটির পাহাড়, ছোট ছোট টিলা আর বনভূমিগুলোকে রক্ষা করা গেলে এ এলাকাটি আকর্ষণীয় একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারের একজন যোগাযোগমন্ত্রী একবার নেত্রকোনা থেকে সড়কপথে দুর্গাপুর এসেছিলেন। যাত্রাপথে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'বাংলাদেশে এতো খারাপ রাস্তা এখনো আছে তা আমার জানা নেই'। যোগাযোগমন্ত্রীর এ ধরনের মন্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায় নেত্রকোনা-দুর্গাপুর রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করলে। দীর্ঘদিনের প্রাচীন পাকা সড়কটি ভেঙে খানাখন্দে পরিণত হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে রাস্তাটি সংস্কারের কোনো কাজ হাতে নেয়া হয়নি। দুর্গাপুর কলেজের ছাত্র আব্দুস সালাম সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে হতাশা ব্যক্তি করে বলেন, 'এখন বিএনপি সরকার দেশ চালাচ্ছে। আমাদের এমপি বিএনপির। আমরা তো এতটুকু আশা করতে পারি যে, এ সরকারের সময় আমাদের এই রাস্তাটি ঠিক করা হবে।'

বর্তমান সরকার নেত্রকোনার শ্যামগঞ্জ থেকে জারিয়া হয়ে দুর্গাপুর এবং দুর্গাপুরের বিরিশিরি থেকে নাজিরপুর হয়ে কলমাকান্দার লেঙ্গুরা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। এলাকাবাসীর অভিমত, এই রাস্তাটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে ঢাকা থেকে খুব সহজেই লেঙ্গুরা বা দুর্গাপুরের আকর্ষণীয় স্থানগুলোতে পৌঁছে যাওয়া যাবে।

ঢাকা থেকে দুর্গাপুর বা কলমাকান্দার লেঙ্গুরার দূরত্ব সর্বোচ্চ ২০০ কিলোমিটার। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকার কারণে এসব স্থানে পৌঁছাতে প্রায় একদিন সময় লেগে যায়। তাছাড়া এসব এলাকায় রাত যাপনের ভালো ব্যবস্থা না থাকায় পর্যটকদের কাছে এলাকাগুলো নজর কাড়তে পারছে না।

সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক বিষয় হলো, এলাকাগুলোর অধিবাসীরা চায় এখানে পর্যটকদের আগমন ঘটুক। সব রকমের সাহায্য করতেও তারা প্রস্তুত রয়েছে।

নেত্রকোনার রয়েছে দীর্ঘদিনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এখানকার প্রতিটি রাজবাড়িকে ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কল্পকাহিনী। সুস্বাদু আর অতিবিপন্ন মহাশোল মাঝে আবসস্থল এটি। শুধু প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনার। সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলে নেত্রকোনা জেলাটি বাংলাদেশে একটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পেতে পারবে।

ছবি : **খালেদ সরকার**